ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বৃটিশ ওয়েদারের মত। এই রোদ, এই বৃষ্টি। কখন কি ঘটবে, কারো তা বলার সাধ্য নেই। কিছুদিন আগেও চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল শান্ত। কোন উত্তাপ-উত্তেজনা ছিল না। স্বাভাবিক নিয়মে ক্লাস হচ্ছিল। পরীক্ষা হচ্ছিল বিভিন্ন বিভাগের। কলগুঞ্জনে মুখর ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। হঠাৎ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় ছাত্রদের মধ্যে পেশীশক্তি ব্যবহার ও পারস্পরিক গুলী বিনিময়। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির এই অবনতি ঘটে তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রুটে বাস সার্ভিস বন্ধ করে দেয়া। সম্প্রতি বাজেট ঘাটতির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত একই ছাত্র সংগঠনের একটি গ্রুপ মেনে নেয়; অন্য একটি গ্রুপ এর প্রতিবাদ জানায়। বিষয়টি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও নিষ্পত্তি করা যেত। তেমন কঠিন কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু এর আগেই দুই গ্রুপে বন্দুক যুদ্ধ বেধে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন। ধারণা করা হয়েছিল যে, পুলিশ এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটে বিপরীত। ছাত্রদের গোলা-গুলীর কারণে তিনজন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ গুলীবর্ষণের অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করে। এতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন সিন্ডিকেটের জরুরী সভা আহ্বান করেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনার পর সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাশাপাশি সকল পরীক্ষা স্থগিত ও পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত ছিল কিছুটা আকস্মিক। ছাত্র-ছাত্রীরা এটি সহজভাবে মেনে নিতে সম্মত হয়নি। পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাত গভীর পর্যন্ত এই নিয়ে হলে হলে চলে বিক্ষোভ সমাবেশ। ভোরবেলা প্রভোষ্ট ও হাউজ টিউটর ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ করার নির্দেশ জানাতে যান। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ঘিরে ধরে এবং সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। জানা যায় যে, এই সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার মত একটি গুজব রটিয়ে দেয়া হয়। ফলে সকাল ৯টা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করতে আরম্ভ করে। প্রকাশিত খবর হতে জানা যায় যে, তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। বেলা ১২টা নাগাদ সব ছাত্রাবাস খালি হয়ে গেলে প্রতিটি কক্ষ সীল-গালা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। গুঞ্জন মুখরিত বিশ্ববিদ্যালয় এখন নিথর-নিস্তব্ধ, কবে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তা নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কতদিনের জন্য বন্ধ এবং পরীক্ষা কতদিনের জন্য স্থগিত করা হলো নির্দেশে এর কোন উল্লেখ নেই।

চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়। জন্ম হতেই এর পরিবেশ এই রকম। প্রথমদিকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণভাবে শেষ করা সম্ভব না হলেও অনেকটা শেষ করা যেত। আশির দশক থেকে শুরু হয় এর পরিবর্তন। তখনই অভ্যুত্থান ঘটে রগকাটা একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন হলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এরা দক্ষযজ্ঞ চালায়। এদের কেউ কেউ দুর্গম পাহাড়ী এলাকা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে বলেও তখন পত্র-পত্রিকায় খবর ছাপা হয়। এদের হাতে শুধু ছাত্ররা নিগৃহীত হয়নি, ছাত্রীরাও চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়। আশির দশকের মধ্যভাগে এই রগকাটা ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা প্রতিবাদী এক ছাত্রকে ধরে একটি ঝুপী বাড়ীর পেছনে নিয়ে যায়। তাকে মাটিতে শুইয়ে জবাই করার পূর্বক্ষণে সে এক বিন্দু পানির জন্য কাতর মিনতি জানায়। ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা তখন তার মুখে প্রস্রাব করে দিয়ে বলে, 'নে পানি খা।' চাটগাঁর পত্র-পত্রিকায় এই বর্বর হত্যাকান্ডের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর উহার তদন্ত হওয়া ও বিচার হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কার্যত কিছু হয়নি। এই না হওয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হচ্ছে গত এক-দেড় দশক যাবৎ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সময় সময় বাধ্য হয়েছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে। এই বন্ধ ঘোষণার ফলে কয়েক বছর আগে পূর্ণ একটি শিক্ষা বছরে ক্লাস হয় মাত্র ৫৭ দিন। অন্য আর এক বছর ৩৬৫ দিনের মধ্যে ক্লাস হয় ৬২ দিন। বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের রেকর্ড আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিদারুণভাবে বিনষ্ট হওয়া বা যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হওয়ার মূল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই, চর দখল করার মত হল দখল করার প্রবণতা, দলীয় বা সমর্থক ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য পেশীশক্তি ব্যবহার এবং টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি। এই টেন্ডারবাজির জন্যই হলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় বেশী। অথচ টেন্ডার ঠিকাদারের কাজ। ঠিকাদারী কোন ছাত্রের কাজ হতে পারে না। এই কাজে যারা মত্ত হয়ে পড়ে প্রকৃত অর্থে এরা ছাত্র কিনা এটি একটি প্রশ্ন। কারণ, ছাত্রের কাজ জ্ঞানের সাধনা করা। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় এবং জাতীয় জীবনে ও সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর ছাত্র নামধারীরা কি এ শাশ্বত সত্যের ব্যাপারে সচেতন? জ্ঞান সাধনার কোন স্পৃহা কি ওদের আছে? কর্মকান্ড দেখার পর এ প্রশ্নের আর বিস্তারিত জবাব দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সংক্ষেপে কেবল এটুকু বলা যেতে পারে যে, ক্যাডারবাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি এবং হল দখল ওদের কাছে মুখ্য। আর জ্ঞানের সাধনা, বিবেক ও মূল্যবোধ ইত্যাদি সবই গৌন বিষয়। এক সময় হলে সিট বরাদ্দ করার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কোন আবাসিক ছাত্র হলের নিয়ম শৃংখলা-ভঙ্গ করলে প্রভোষ্ট ও হাউজ টিউটরগণ বিনা দ্বিধায় সিট বাতিল করে দিতে পারতেন। কিন্তু দিনে দিনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকাল প্রভোষ্ট এবং হাউজ টিউটরদের হলে অবস্থান করাই এদের দয়া ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। প্রশ্ন হচ্ছে, পরিস্থিতির এই আমূল পরিবর্তন কেন? এরা কি সংখ্যায় বিপুল? এরা কি এক-একজন মহাপরাক্রমশালী কালা পাহাড় যে দমন করা সাধ্যাতীত?

না, এর কোনটাই নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা সংখ্যার নগণ্য। মহাপরাক্রমশালীও নয়। চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। এই ষোল হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে সন্ত্রাসী চরিত্রধারী তথাকথিত ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট জনের বেশী নয়। পক্ষান্তরে এরা মহাবলী নয়, বরং হীনবল–এবং সম্মুখে দাঁড়ালে 'পথ কুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে' পালাতে বাধ্য–জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা এর প্রকৃষ্ট নজির। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো ছিল 'কিলার গ্রুপ' ও 'রেপিষ্ট গ্রুপের' অভয়ারণ্য। এদের জন্য কারো নিয়মিত পড়াশুনা করার কোন উপায় ছিল না। ছাত্রীদের সদা-সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। এদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে এদের উৎখাতের দৃঢ় প্রত্যয়ে ছাত্রীরা একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অভিযান চালায়। ছাত্রীদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী অভিযানের মুখে 'রেপিষ্ট গ্রুপ' প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। '৯০ সালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। তবে সে বিতাড়ন ছিল সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। সকল ছাত্র সমাজ তখন একত্রিত হয়ে বিতাড়িত করেছিল। ফলে এদের প্রকৃত শক্তি বুঝা কিছুটা অসুবিধাজনক ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের সাহায্য ছাড়া বিতাড়িত করে এককভাবে। এতে এদের শক্তি কত তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরা যে নৈরাজ্য ও তান্ডব চালাতে সক্ষম হচ্ছে এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী মহলের মদদ। বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন একশ্রেণীর শিক্ষকের আশ্রয়-প্রশ্রয় যে নেই হয়তো তা-ও নয়, এই আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ প্রদান বন্ধ করা হলে সাধারণ ছাত্র সমাজই এদের প্রতিহত করতে সক্ষম।

শিক্ষার সাথে জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন-তখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি। এর ফলে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছাত্র সমাজ। তৎসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অভিভাবক ও জাতীয় স্বার্থ। ঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যর্থতা হতে সেশন জট বাধে। বয়স বেড়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বৃহৎ কর্মজীবনে প্রবেশ বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে অভিভাবকদের বহন করতে হয় বাড়তি অর্থনৈতিক চাপ। আর শিক্ষার মানের অধোগতি ঘটায় জাতিকে যে কতবড় ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থায় কোন দল বা কোন প্রভাবশালী মহলেরই এই শ্রেণীর ছাত্র নামধারীদের আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত হতে পারে না। বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো ও সহযোগিতা করা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে, 'কিলার গ্রুপ' বা 'রেপিষ্ট গ্রুপ' বিশেষণে বিশেষিত হওয়া ন্যূনতম সম্মানবোধ, রুচিবোধ ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থীর কাম্য হতে পারে না। এই কলঙ্ক-হার গলায় নিয়ে বাঁচা আর না বাঁচার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

তারিখ ... AUG 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬